Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 226 – 233
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বাস্তব ও সত্যের দুই মুখ নিখিলেশ ও সন্দীপ : রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্ব

সোনালী দেবনাথ
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sonalidebnath303@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Humanity, Truth, Reality, Realism, Naturalism, Struggle, Opposite entity, Instinct, Freedom.

Abstract
In world literature, the literary genre called the novel was born after the industrial revolution in the eighteenth century. The melodious sound of poetry had no value in modern complex life. Complicated real-life stories became popular. Bengali literature started writing novels in the 19th century. Bankim Chandra Chattopadhyay started it, but Rabindranath Tagore developed this style of novel. Although the subject matter of writing a novel based on complex life stories is materialistic, Rabindranath Tagore, a poet by nature, added poetic elements to it. In the 20th century, realism and naturalism became popular in world literature. But Rabindranath, the worshiper of truth, was strongly opposed to enslaving reality in literary writing. Human instincts were being supported in the name of reality. Man became man by conquering his instincts but the slavery of those instincts was being celebrated. The map of the country was worshiped in the name of the country. People were being tortured in the name of freedom. Which deeply saddened the humanitarian Rabindranath. He was looking for a way out of it. During World War I, violence was rampant. Seeing this form of violence, he was shaken to the core of the truth and beauty he had worshiped forever. However, he wanted to rely on humanism. The conflict between good and evil can be seen in the novel Ghore-Baire. Nikhilesh symbolizes eternal truth and Sandeep symbolizes reality. Bimala is torn between these two opposites. She is the wife of the landlord. Never went out of the house. But she feels attracted towards her husband Nikhilesh's friend Sandeep. The character of Bimala, symbol of binding ties, is like the romantic mind of Rabindranath who has always remained steadfast on the path of truth. But seeing this deviation of humanity in the wartime situation raised doubts. The two contrasting characters in the novel are like two separate entities of Rabindranath who are at odds with each other. started questioning each other. The present research article tries to trace the direction in which Rabindranath steered this two-way struggle between reality and truth.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226-233
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

কাব্য কল্পনার জগতকে অতিক্রম করে কথা সাহিত্যের আবির্ভাব। দেশীয় ভাবনায় কথা অর্থে গল্প বলার একটি বিশেষ ধরনকে বোঝানো হয়। আমাদের দেশে কথকতা থেকেই কথা সাহিত্য পরিভাষাটি এসেছে। প্রচলিত কাহিনি বা পৌরাণিক কাহিনিকে মুখে মুখে বলে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই কথকতা হিসাবে পরিচিত ছিল। কথকতা করা হত কাব্যিক ভাষাতে। কিন্তু বিদেশে যাকে নভেল বলে বাংলায় সেই জাতীয় সাহিত্য রচনার প্রচলন হয় উনিশ শতকে আর বিদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের পরে 'নভেল' শৈলীতে সাহিত্য রচনা শুরু হয়। শিল্প বিপ্লবের পরে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হল, তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল জীবনের জটিলতা। মানুষ আর তার ছোট্ট নীড়ে বসে দূর আকাশের কল্পনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখল না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাগর পেরিয়ে, আকাশে উড়ে, মাটির নিচে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের দ্বার একে একে মানুষ শুধু যে খুলে ফেলল তাই নয়, তাকে নিজের বশে এনে, তা থেকে রোজগারের পথ আবিষ্কার করে ফেলল। মানব জীবনের সবচেয়ে গূঢ়তম রহস্যাবৃত অংশ যে নরনারীর সম্পর্ক তার মধ্যে বাসা বাঁধল নানা জটিলতা। নাগরিক হতাশা ছেয়ে ফেলল মানুষকে, কাব্য কবিতার রোমান্টিকতাকে পরিত্যাগ করে, বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দৈনন্দিন জীবনের ওঠা-পড়াই হয়ে উঠল সাহিত্যের বিষয়। আমাদের দেশে উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে উপন্যাসের জয়যাত্রার সূচনা হলেও তা পূর্ণতা পায় রবীন্দ্রনাথের রচনার মাধ্যমে। রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করে যে সাহিত্য প্রকরণের সূত্রপাত সেখানে কবি রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষপাত যে সব ধারণাকে ঘেঁটে দিয়ে নতুন কিছু ভাবতে বাধ্য করাবে সে তো স্বাভাবিক। অ্যাখ্যানতত্ত্বের দিক থেকে উপন্যাস সর্বজ্ঞ কথকের কাহিনি বর্ণনা থেকে হতে পারে বা উত্তম পুরুষ বক্তার বর্ণনা থেকে হতে পারে। বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখা যায় সর্বজ্ঞ কথক বক্তার সরাসরি পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে একেবারে গ্রাহ্যই করলেন না। বঙ্কিমের মত তাঁর দায় নেই পাঠককে তাঁর নির্দেশিত আদর্শ পথে চালিত করার। তিনি মনে করেন না আদর্শের পথে চালিত করে মানুষের হিতসাধনই কেবল সাহিত্যিকের লক্ষ্য। বরং তাঁর কাছে –

> "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
> কবি, তব মনোভূমি, রামের জন্মস্থান
> অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"[১]

যা ঘটে তাই বাস্তব কিন্তু যা ঘটে না তা বাস্তব না হলেও সত্য হতে কোনো বাধা নেই। তাই বাস্তবের মঙ্গল-অমঙ্গল, নীতি-আদর্শ, হিত-অহিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকলেও সত্যের সঙ্গে তিনি সত্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে আছেন। তাই পাঠককে সম্বোধন করে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করে আপনার মান্য নীতি প্রচারের বদলে তাঁর কাছে নিজের সত্য বিশ্বাসের কাছাকাছি থেকে, তাকে প্রতিদিনের যাপনে সঙ্গে নিয়ে চলাই শ্রেয়।

রোমাটিক কবির বহিঃদৃষ্টি অপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টি অধিক প্রখর। সাহিত্য তাঁর বহির্মুখী সত্তাকে অন্তর্মুখীন করে জীবনের এক অপার রহস্যের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়[২]। ভিতরের দিকে তাকিয়েই তিনি জগত দেখতে পান। তাঁর রচিত জগতই তাঁর কাছে সত্য, বা বলা যায় সকলের কাছে সত্য। কারণ সত্যের কোনো দ্বিতীয় রূপ থাকতে পারে না। সুন্দরই সত্য বা সত্যই সুন্দর। তাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা আত্মকথনের ভঙ্গিতে নিজেদের কথা বলে যায়। যে বিষয় নিয়ে কথা বলা হয় সেই বিষয় কিন্তু এক থেকে যায়। ঘরে বাইরে উপন্যাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের ওপরে যখন কথা হয়েছে, যেমন– বিমলার বাইরে যাওয়া, স্বদেশি দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলা উচিত কিনা, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে পাশ্চাত্যের মত খোলাখুলি আলোচনা হওয়া উচিত কিনা ইত্যাদিতে বিমলা, সন্দীপ এবং নিখিলেশ তাদের মতামত প্রকাশ করেছে কিন্তু আদতে তা রবীন্দ্রনাথেরই ভিন্ন মতের প্রকাশ। সর্বজ্ঞ কথক যখন গল্প বলে যান তখন গল্প বলাই হয় প্রধান সেই ফাঁকে ফাঁকে তিনি চরিত্রের মনের কথা অন্তরের অন্তস্থল থেকে টেনে বের করে আনেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিটি চরিত্রের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শই কাহিনি হয়ে এগিয়ে গেছে। এমনটা বোধ হয় আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। ঘটনাক্রম ধরে সাজালে এই উপন্যাসে আছে পর্দানশীন জমিদারবধূ

বিমলার ঘর ছেড়ে বাইরে আসা, জমিদার নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপের নিখিলেশের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ, স্বদেশি প্রচার, বিমলার সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ, বিমলার নিখিলেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, স্বদেশি প্রচারকে কেন্দ্র করে গ্রামে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া ও তাতে নিখিলেশের ক্ষতিসাধন। সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি বিচার করলে মোটের ওপর তাই দাঁড়ায়। তবে এর মধ্যে আদি, মধ্য, অন্তবিশিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট ক্রম নেই। প্রতিটি ঘটনাই ঘটে যাওয়ার পর চরিত্রেরা তাদের মত করে ঘটনাগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসে এবং তাতে কাহিনির অন্তর্গত ঘটনা হিসাবে এগুলি গুরুত্ব হারায়। বদলে বিশ্লেষণগুলিই যেন কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঘটে যাওয়া ঘটনার বদলে পাঠকও বিশ্লেষণটা পড়ে কাকে কতখানি সমর্থন করা যায় তাই নিয়ে ভাবতে বসবেন। রবীন্দ্রনাথও আসলে তাই চেয়েছেন, নিখিলেশ এবং সন্দীপের আইডিয়ার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে উপন্যাস ফেঁদে বসেছেন। রোমান্টিক কবির মন নিয়ে কারবারই শেষ পর্যন্ত জিতে গেল, আইডিয়ার দ্বন্দ্ব রূপ পেয়ে গেল উপন্যাসের। উপন্যাসে সন্দীপ বলেছে মেয়েরা আসলে বাস্তবের কারবারি হয়তো রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাই ভেবেছেন তাই নিখিলেশ আর সন্দীপের আইডিয়ার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া[৩] ছাড়া ইংরেজি জানা বিমলার আর কিছু করার ছিল না উপন্যাসে। বাঁধা নিয়ম, বাঁধা বোধ আর বাঁধা বিশ্বাসের প্রতীক বিমলা।[৪] কিন্তু মানুষ এই বাঁধা সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে অনন্ত প্রসারিত। ঘরের মধ্যে বিমলা নিখিলেশ ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের সান্নিধ্য পায়নি তাই সে চেয়েছিল বিমলা বাইরে এসে পৃথিবীসুদ্ধ সকল পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে নিখিলেশের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিক, সেই হবে তাদের ভালোবাসার সত্যকার পরিচয়। নিখিলেশের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বিমলা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে চাইতে পারেই না কিন্তু প্রবৃত্তি মানুষকে বাঁধা বোধের বিপরীত দিকে চালিত করে। এক্ষেত্রে বিমলা প্রবৃত্তির আমোঘ আকর্ষণে সন্দীপের দিকে ছুটে চলল, সে মনের মধ্যে যে শক্তিকে অনুভব করল সেই শক্তি আসলে প্রবৃত্তির শক্তি।[৫] আসলে মেয়েরা বরাবরই নিখিলেশের মত সত্যধ্যানীর বদলে সন্দীপের মত বাকপটু গতিশীল পুরুষের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করেছে। ঘরে বাইরের বিমলা তাই রক্ত মাংসের জীবন্ত নারী। রবীন্দ্রনাথের মননের দায়ভার বিমলাকে কমই বইতে হয়েছে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবানুগ। তবে বিমলার বাস্তবতা সত্যেরই নামান্তর। মেয়েরা সত্যই এমনটা হয়। এই বাস্তবতা থেকে সন্দীপের বাস্তবতা ভিন্ন। সন্দীপ সর্বদা যে বাস্তবতার জয়গান করে চলে তাও আসলে এও প্রকারের আইডিয়া যে আইডিয়া চাপিয়ে দেওয়া। সাহিত্যে যে বাস্তবতার রঙ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল বিশ শতকে - সন্দীপ সেই বাস্তবতা। তাই তো নিখিলেশের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইউরোপ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের মন তখন ভারাক্রান্ত। চারিদিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা, মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের লোভ দেখে মানুষের শাশ্বত বিচারবুদ্ধির ওপর থেকে প্রায় বিশ্বাস হারানোর মত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি। এমন সময় সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' সাহিত্য পত্রিকাটির পথ চলা শুরু হয়। সাহিত্যচিন্তায় ও ভাযাচর্চায় সকল প্রকার ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, বিশেষণবাহুল্য, ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। সম্পূর্ণ পরিশীলিত, রুচিশীল বিদগ্ধ নাগরিক মন নিয়ে তিনি চেয়েছিলেন স্বভাবে-চরিত্রে-আচরণে-ভাষায় এক যুক্তিবদ্ধ ঋজুতা ও মেদহীন ব্যক্তিত্বের দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানালেন, অভিবাদন জানিয়ে লিখলেন – 'সবুজের অভিযান'। ১৯১৬ তে এসে এই সবুজপত্রেই প্রকাশ পেল 'ঘরে বাইরে'। ততদিনে সাহিত্য রচনার আধার কি হবে তাই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। যুদ্ধের পরিস্থিতি মানুষের মন থেকে সমস্ত শুভ চেতনাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত উপন্যাসে বাস্তববাদ সবচেয়ে বেশি জেঁকে বসেছিল। আর অন্তত দু-তিন দশক ধরে বিশদ বাস্তবের নিখুঁত উপস্থাপনার চল সাহিত্যে কর্তৃত্ব করেছিল।

সাহিত্যে বিজ্ঞানবাদ আসর গেড়ে বসার প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের সাতের দশকের মধ্যেই খাঁটি বাস্তববাদী সাহিত্য-তৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসে। এ সময় মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে দেখা এবং পরীক্ষা করার তুমুল উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। এর পেছনে ডারউইনবাদের বড় ভূমিকা আছে। ঝোঁকটা ছিল মানুষের গতি ও প্রবণতা নির্ধারণ করে মানুষ সম্পর্কে বিজ্ঞানীর মতো নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদন করা। সাহিত্যের ইতিহাসে এ প্রবণতা চিহ্নিত হয় প্রকৃতিবাদ বা স্বভাববাদ নামে। ইংরেজি নাম ন্যাচারালিজম। প্রকৃতিবাদীরা মনে করতেন, বাইরের দিক থেকে পরিবেশ-পরিস্থিতি

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক যেমন ভিতরের দিক থেকে মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষুধা ও যৌনতার মতো প্রবৃত্তির তাড়নায়। এদিক থেকে মানুষকে দেখা হতো নিয়তচালিত জীব হিসেবে। মনে করা হত, পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে ঠিকমতো স্থাপন করা গেলে মানুষকে ঠিক সে রকম নিশ্চয়তার সাথে উপস্থাপন করা সম্ভব, একজন ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে যে রকম নিশ্চয়তার সাথে মানুষের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কারবার করেন। বাস্তববাদকে ছাপিয়ে গিয়ে শুরু হয় প্রকৃতিবাদের চর্চা। প্রকৃতিবাদীদের সাথে বাস্তববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বিরাট। একদিকে মানুষকে বা মানব জীবনকে বিশেষ জীবনদৃষ্টির অনুকূলে আবিষ্কার করা, অন্যদিকে জীবন যে রকম সেভাবে উপস্থাপন। এ পার্থক্য সত্ত্বেও বাস্তববাদী সাহিত্যের কলাকৌশল প্রকৃতিবাদী সাহিত্যিক চর্চায়ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যদি মানুষকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করতে হয়, তাহলে চাই বাস্তবের নিখুঁত উপস্থাপন। বাস্তবের প্রতীতি তৈরি হওয়া ছাড়া তো নিখুঁত পরিপ্রেক্ষিতের আন্দাজ পাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিবাদী চর্চায় তাই বাস্তববাদের চর্চাও পরোক্ষে অঙ্গীভূত ছিল। এ কারণেই জোলা বা বালজাকের মতো প্রকৃতিবাদী ঘরানার বড় লেখকেরা বাস্তববাদেরও বড় লেখক।[৮] বাখতিন উপন্যাসের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, বর্তমানকে আবিষ্কার করতে পারা আর যথাযথ মূল্যমানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা একটা আধুনিক ঘটনা; আর উপন্যাসের অসামান্যতার একটা বড় কারণ এই বর্তমানময়তার শিল্পরূপ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা।

তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্য বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। মানুষকে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দাস করে দেখা, কেবলমাত্র পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ীই মানুষের কার্যকলাপকে সমর্থন করা এসব রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারে কাছেও কখনো আসতে পারেনি। অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে পৃথক কোনো বর্তমান কালের অস্তিত্বই তাঁর কাছে ছিল না। কাল অখন্ড। এই সমগ্র জীব জগত থেকে পৃথক করে নিয়ে মনুষ্যলোকের পৃথক অস্তিত্বও তাঁর কাছে ছিল না। ভূমার মধ্যে থেকে মানুষের যতটুকু অংশ তার নিজের সেটুকুই তিনি স্বীকার করেছেন। সেখানে একক ব্যক্তি মানুষের বা অখন্ড কাল প্রবাহ থেকে এক খন্ড কেটে নিয়ে কোনো বর্তমান কাল তাঁর কাছে অস্তিত্ববান হতে পারে নি। বস্তুত কবি, রবীন্দ্রনাথ তাই উপন্যাসের এই পরিসরে এসে নিজের মনের দ্বন্দ্বকেই এক একটি চরিত্র করে তুলেছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন তাঁর চিরকালীন ঔপনিষদীয় ভাবধারায় সামান্যতম হলেও আঘাত এসেছে। ইউরোপ ঘুরে এসে দেখেছেন যুদ্ধের বাজারে মানবতা ভূলুণ্ঠিত, সাহিত্যের জগতে সত্য-সুন্দরের জয়গান স্তব্ধ হয়ে বাস্তবতার নামে মানুষের পরিত্যাজ্য গুণগুলিকে নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য শুরু হয়েছে তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। 'ঈশাবাস্য মীদং সর্বং'- এর যে দীক্ষা তিনি পেয়েছেন ঈশোপনিষদ থেকে যা ত্যাগের পথে মানব কল্যাণের কথা বলে, তার বদলে প্রবৃত্তির দাস হয়ে মানুষ লোভের কাছে মাথা বিকিয়ে বসে রয়েছে। এই নির্মম বাস্তবকে তিনি মানবেন কি করে? মানুষকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করে তার দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ সব অঙ্ক কষে নির্ধারণ করার এই ছেলেমানুষী খেলায় তিনি মেতে উঠতে পারেন নি। তিনি জানেন মানুষ সব রকম অঙ্ক কষা জ্ঞানের ঊর্দ্ধে। মানুষের মন আদি-অন্তহীন বিশ্ব চৈতন্যেরই অংশ, তাকে প্রবৃত্তি বা পরিপ্রেক্ষিতের গন্ডীতে বেঁধে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয়। তবে গোঁড়ামি যেহেতু তাঁর কাছে সর্বৈব পরিত্যাজ্য তাই নতুনকে জানা আর স্বাগত জানানোর উৎসুক মন নিয়ে তিনি এই সব নতুন চিন্তার ঘাটে ঘাটে তাঁর তরী ভিড়িয়ে দেখলেন। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তাঁর আজন্ম লালিত চেতনাতেও হয়তো বা কিছু পরিবর্তন এসেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিকতার এই নতুন ঘাটে তাঁর মনের তরী শান্তি পেল না। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর নিজের কাছে। ঘরে বাইরের বিমলা যেন রবীন্দ্রনাথের সেই অন্তর্মুখী রোমান্টিক কবি মন যে কখনো বাইরের আলো দেখেনি। বিমলা যেমন করে ঘরের সংস্কার নিয়ে বাইরে এসে পড়েছিল তেমন ভাবেই রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বিশ শতকের এই সাহিত্যিক আন্দোলনের মধ্যে এসে পড়লেন তাঁর সেই ঔপনিষদীয় মানবতা বাদের সংস্কার নিয়ে। স্বভাবতই ক্ষত-বিক্ষত হলেন। নিজের মনের মধ্যেই তৈরি হল নানা দ্বন্দ্ব-সংশয়।

এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের একদিকে নিখিলেশ আর একদিকে সন্দীপ। একজন বিশ্ব-চৈতন্যের অংশ মানবকল্যাণের প্রতীভূ চিরন্তন সত্য আর একজন খন্ড বর্তমানের প্রতিনিধি প্রবল গতিশীল বাস্তব। রবীন্দ্রনাথের পাল্লা ঝুঁকে পড়েছে নিখিলেশের দিকে। সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু নিবিড় পাঠ থেকে বেরিয়ে আসবে নিখিলেশের ভিতরকার সন্দীপ আর

সন্দীপের ভিতরকার নিখিলেশ। সেইখানেই ধরা পড়বে রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার সংশয়। তবে প্রথমে তাদের মধ্যেকার মূল পার্থক্যগুলো নিয়েই কথা বলা যাক। নিখিলেশের সঙ্গে সন্দীপের প্রধান পার্থক্য হল- সন্দীপ প্রবল ঝড়ের মত, বাগ্মী সন্দীপ কথা দিয়েই জগত জয় করতে পারে, জয় করতে পারে নারীর মন কিন্তু জয় করাটুকুই তার লক্ষ্য তারপর সেই নারীর প্রতি আর কোনো টান সন্দীপ অনুভব করে না। সন্দীপের কাছে দেশ একটা মানচিত্র, সেই দেশের মাতৃ প্রতিমা নির্মাণ করে সে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে দেশকে মাতিয়ে তুলতে চায় কিন্তু তার জন্য দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করতেও সে পিছপা নয়। কিন্তু নিখিলেশ দেশকে মাতৃ রূপে পূজা করার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে দেশের মানুষের মুক্তি, সেই মুক্তি শুধু ইংরেজের হাত থেকে দেশের মানুষের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর নয় সে হল সর্বাঙ্গীন মুক্তি। অশিক্ষা, অনাহার, কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি। স্বাধীনতার নামে দেশের গরীব মানুষের ওপর অত্যাচার সে মেনে নিতে পারে না। দেশের নামে দেশের মানুষের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র, নির্দ্বিধায় দেশের মানুষকে হত্যা সে মেনে নিতে পারে না। সন্দীপের মত নিজের চারপাশের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিতে পারে না নিখিলেশ।

সন্দীপ ইংরেজ ফরাসী রুশ জার্মানের তুলনা টেনে বলে –

> "ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, রুশ এমন কোন সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?"[৭]

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ করে এসে এই চুরির স্বরূপ দেখেছেন। তাই নিখিলেশকে দিয়ে বলান,

> "সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে! ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি।"[৮]

কিন্তু সন্দীপের কাছে দেশ হল– আমার মোহ আছে আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব, আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব, যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। এই বলির পশু যদি দেশের গরীব মানুষ হয় তাহলেও অসুবিধা নেই। এই বলির প্রয়োজন সাধিত হয় পঞ্চুর মত গরীব প্রজার সামান্য পুঁজির ব্যবসায় আগুন লাগিয়ে, পঞ্চুর দোষ সে বিলাতি কাপড়, র‍্যাপার গাঁয়ের কৃষকদের বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়ায়। বিলাতি কাপড় বর্জন করতে হবে তাই আগুন লাগিয়ে দাও পঞ্চুর সামান্য পুঁজিটুকুতে। মুসলমান প্রজাদের হাটে বিলাতি কাপড় বিক্রি বন্ধ করা যাচ্ছে না, ষড়যন্ত্র করে দাও মীরজানের মত প্রজার নৌকা জলে ডুবিয়ে। সন্দীপের মত দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষকে এইটুকু কষ্ট সাধন করতেই হবে। কিন্তু নিখিলেশ কোনো রকম জুলুমের পক্ষপাতী নয়। দেশের মানুষকে সন্দীপ দেশ নামক আইডিয়ার থেকে পৃথক করে দেখে তাই দেশের জন্য দেশের মানুষের ওপরেই জুলুম করতে সন্দীপের বাধে না। কিন্তু নিখিলেশের কাছে দেশ কোনো আইডিয়ায় গঠিত মূর্তি মাত্র নয়, দেশের মানুষই হল দেশ বা বলা যায় মানুষের জন্যই দেশ, দেশের জন্য মানুষ নয়। এতো গেল দেশ নিয়ে দুজনের ভিন্ন মত। এরপর আসে প্রবৃত্তির বিষয়। এখানেও সন্দীপ বিদেশের বিজ্ঞানবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষের গায়ের জোরে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা বলে–

> "যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েচে সেইটুকুই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি, কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হলো সমস্ত জগতের শিক্ষা ... আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব, আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে, আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি, - আমরা সকাল বেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারিনে; অতএব পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা পারবো না। হয় চুরি করবো, নয় ডাকাতি করবো।"[৯]

পাশ্চাত্যে বাস্তববাদকে অতিক্রম করে সাহিত্যে প্রকৃতিবাদ তখন মাথাচাড়া দিয়েছে। এই প্রকৃতিবাদ দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে খালি চোখে যেমনটা দেখা যায় তেমন করেই দেখতে চায়। নরনারীর মাঝে প্রেমকে বাদ দিয়ে শুধু যৌনতাকে বড় করে দেখানোই তার উদ্দেশ্য। তার ভাবখানা এমন যেন নারীর প্রতি পুরুষ আকৃষ্ট হয় কেবলমাত্র যৌনতার জন্য। যৌনতার উদ্দেশ্যেই পুরুষ যত রকম মিষ্টি কথার ফাঁদ পেতে নারীকে ভোলায়। নারী আর পুরুষের মধ্যে সেতু বেঁধে

রেখেছে একমাত্র যৌনতা। স্ত্রী পুরুষের মিলন রীতি বিষয়ক একটি ইংরেজি বই সন্দীপ বৈঠকখানায় ফেলে যায় সেই বই বিমলার হাতে পড়ে। বইটি সম্বন্ধে সন্দীপ বলে–

> "এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা। কোনো-রকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছা ছিল এই বইটা নিখিল পড়ে। ... কি স্বদেশ কি অন্য বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায় তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে; - কিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে, কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে – কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।"[১০]

এর বিপরীতে নিখিলেশের কণ্ঠ শোনা যায়–

> "উপায় নেই প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই ফলের মধ্যে আত্মাকে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য করে দেখা তা বলবো না।"[১১]

দেশ সম্বন্ধে নিখিলেশ বলে,

> "যেখানে দেশ বলে, আমি আমাকেই লক্ষ্য করবো, সেখানে সে ফল পেতে পারে কিন্তু আত্মাকে সে হারায় – যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে, সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে কিন্তু আপনাকে সে পায়। ... মানুষ এতো বড়ো যে, সে ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই – বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, সে কি ফলের সাধনা?"[১২]

বিমলাকে মাঝে রেখে নিখিলেশ ও সন্দীপের এই দর্শনের দ্বন্দ্ব এগিয়ে গেছে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে।

বিমলার মত করে যে রবীন্দ্রনাথের যে অন্তরাত্মা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, স্বভাবতই বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে যিনি সর্বদা একাত্ম অনুভব করতেন সেই মরমী মনের ওপর ছায়াপাত করেছিল বিশ্বের দরবারে ঘটে চলা যুদ্ধ, মনুষ্যত্বের অপমান। অন্য দিকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আধিপত্য শুরু করেছিল বাস্তববাদ, প্রকৃতিবাদ ইত্যাদি, যার লক্ষ্যই ছিল বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষের জীবনকে অঙ্কের হিসাবে মেলানো, তাকে প্রবৃত্তির দাস করে দেখা, বাস্তবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে প্রেমের বদলে কুৎসিত যৌনতাকেই নরনারীর জীবনের একমাত্র সত্য করে দেখানো। এই সবকিছু একসঙ্গে তাঁর মনে যে জটিলতার সূত্রপাত করেছিল তারই ফলশ্রুতি নিখিলেশ আর সন্দীপ – পরস্পর যুযুধান এই দুটি চরিত্র।

এই দুই চরিত্র যতই তাদের অবস্থানে অটল থাকুক না কেন দুজনেরই দীর্ঘ আত্মকথনের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পড়েছে দুজনের স্বভাবের বিরোধী দুই সত্তা। আর দুজনেই তাতে খেদ প্রকাশ করেছে। শুদ্ধ চিত্ত নিখিলেশের মনের ছন্দ পতন যেখানে তার নিজের কাছে ধরা সেখানেই সে লজ্জিত হয়ে সত্যের আরও কঠিন তপস্যায় নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। নিখিলেশের মনে অপূর্ণতার ব্যথা সে আইডিয়া নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, বাস্তব এসে আইডিয়াকে ভেঙে দিয়েছে।[১৩] নিখিলেশ যখন বাইরে বের করে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিমলার মেলামেশা করিয়ে দিয়ে দেখতে চেয়েছে তার পরেও বিমলা শুধু তার হয়েই ঘরে ফেরে কিনা এই দেখতে চাওয়ার মধ্যে ভাবনার উদারতা যতটা আছে, ঠিক ততটাই আছে বিমলার সতী মনকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা। ঘরের মধ্যে থেকে বিমলাকে নিজের মনের মত করে গড়ে তোলা যায়নি। বাইরের পুরুষের সান্নিধ্য পেয়ে সে প্রবৃত্তির তাড়নাতেই সব ভেঙে এগিয়ে গেছে। এতে নিখিলেশ কষ্ট পেয়েছে, তার সত্যের সাধনা যদি সম্পূর্ণ হয়ে থাকত তাহলে বিমলার সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও কষ্ট না পেয়ে তা সহজ মনে মেনে নিতে পারত। যে নিখিলেশ বলে যে সহধর্মিণী গড়তে গিয়ে আমরা স্ত্রীকে হারাই সেও কি নিজের অজান্তেই বিমলাকে স্ত্রীর থেকেও বেশি সহধর্মিণী বলেই ভাবে নি? সেও যে তাই ভেবেছিল তার প্রমাণ মেলে তার নিজের কথায় –

> "আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটি সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করবো আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে।"[১৩]

নিখিলেশ এই ভুল শুধরে নিতে চেয়েছে সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তাঁর সাধনার মাধ্যমে।

অন্যদিকে সন্দীপও ঠিক সব সময় তার সুকঠিন বাস্তবিক মারমুখী, গতিশীল প্রবৃত্তির দাস হয়ে থাকতে পারেনি। মন প্রাণ ঢেলে প্রবৃত্তি জননীর পায়ে ফুল চড়ালেও শেষ পর্যন্ত নিজের অজান্তেই সত্যের পূজা সে করেছে। সন্দীপের বলে–

> "ভারতবর্ষে আমার জন্ম – সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না।"[১৪]

বিলাসী সন্দীপ দেশের নামে চাঁদা তুলে সেই টাকায় নিজে রেলের প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ করে, বিলাতি সিগারেট খায়। কিন্তু সেই সন্দীপও বিমলার নিজের বাড়ি থেকে চুরি করা টাকা শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং বলে–

> "গিনি ফিরিয়ে দেওয়ার মতো ছিঁচকাঁদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু - ...মক্ষিরাণী, এতোদিনে সন্দীপের নির্ম্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেচে – রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখছি সে নিতান্ত ফাকি নয় – তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই।"[১৫]

শেষ পর্যন্ত নিখিলেশ আর সন্দীপ দুজনেই এই কিন্তুর সামনে দাঁড়ায়, দুজনকেই এই 'কিন্তু' গুলোর উত্তর নিজেদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে হয় বা বলা ভালো নিখিলেশ বা সন্দীপের হয়ে রবীন্দ্রনাথকেই এই 'কিন্তু' গুলোর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হয়। নিখিলেশ আর সন্দীপ যেন রবীন্দ্রনাথেরই দ্বিধাবিভক্ত দুই সত্তা যাদের সঙ্গে রোজ লড়াই বাঁধে তাঁর নিজেরই। উপন্যাসে যেমন করে বিমলাকে এই দুই বিরুদ্ধ সত্তার সমান আকর্ষণ বলের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হয়েছে। বিশ শতকের পরিবর্তিত সমাজ চেতনার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন নিজেকে প্রশ্ন করেছেন বাস্তববাদী সন্দীপ হয়ে আর উত্তর খুঁজেছেন সত্যবাদী নিখিলেশ হয়ে।

Reference :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কাহিনী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২১
২. জানা, মনোরঞ্জন, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' (সাহিত্য ও সমাজ), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১৮
৩. তদেব, পৃ. ২৮০
৪. তদেব, পৃ. ২৬৯
৫. তদেব, পৃ. ২৭৩
৬.https://samakal.com/kalerkheya/article/2303163909/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ঘরে-বাইরে', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা, ১৯২৬, পৃ. ৪৩
৮. তদেব, পৃ. ৪৪
৯. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫
১০. তদেব, পৃ. ৮৪
১১. তদেব, পৃ. ১৩২
১২. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প', দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১২০

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ঘরে-বাইরে', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা, ১৯২৬, পৃ. ১০১

১৫. তদেব, পৃ. ১৩৩

১৬. তদেব, পৃ. ৩৪৬